KATHOPOKATHAN - ATIT O BARTAMAN
DOUBLE-BLIND PEER-REVIEWED JOURNAL
Website – kathopokathan.in Email - kathopokathanjournal@gmail.com
Volume : 01, Issue : 01, (July - December) 2024
Published On 15th September 2024

রাজা রামমোহন রায়ের বিজ্ঞানমনস্কতা এবং ভারতের নবজাগরণ

শিবশংকর সেনাপতি
প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক, বীরভদ্রপুর রঘুনাথ হাই স্কুল (উ : মা)

সারাংশ-

রেনেসাঁস বা নবজাগরণের প্রেরণায় বাংলা তথা ভারতবর্ষের জনজীবনে এসেছিল যে পরিবর্তন, বিপুল উচ্ছ্বাস ও উন্মাদনা, তারই ফলে মধ্যযুগের অবসান হয়ে নতুন যুগে উপনীত হল আমাদের এই দেশ। মধ্যযুগীয় ধর্ম ও কুসংস্কারের বিরোধিতায় এবং জ্ঞান বোধ যুক্তি ও মননশীলতার প্রকাশে, উজ্জ্বল উদ্দীপিত মানবচেতনার আদিগন্ত বিস্তৃতিতে যে নবীনের অভ্যুদয় ঘটল তার সার্থক প্রকাশ দেখা দিল রামমোহন রায়ের মধ্যে। তিনি যথার্থই ছিলেন Morning Star of Indian Renaissance, রামমোহন ছিলেন বাংলা তথা ভারতবর্ষের প্রথম বুদ্ধিজীবী। তাঁর জ্ঞানদীপ্ত বুদ্ধিমার্গীয় ভাবনাচিন্তা দেশের সীমাকে অতিক্রম করে সাগরপারে পাশ্চাত্য ভূখণ্ডে পরিব্যাপ্ত হয়েছিল এবং তিনি সেখানে মহৎ ব্যক্তিত্বের সম্মান ও মর্যাদা লাভ করেছিলেন। রামমোহন ছিলেন মানবতাবাদী– সতীদাহপ্রথা রদের জন্য তিনি প্রয়াসী , আবার মধ্যযুগীয় ধ্যানধারণার অতিক্রান্তে মানবতার উজ্জ্বল প্রকাশে তৎপর। রবীন্দ্রনাথের ভাবনায় রামমোহন ছিলেন 'ভারত পথিক'। ভারতবর্ষকে তিনি দেখেছিলেন মহাপথরূপে যে পথে আদিকাল থেকে চলমান মানুষের ধারা প্রবাহিত। ভারতবর্ষের সর্বশ্রেষ্ঠ দান নিয়ে রামমোহন এই পথের চৌমাথায় এসে দাঁড়িয়েছিলেন— তাঁর হৃদয় ছিল ভারতের হৃদয়ের প্রতীক — যেখানে হিন্দু মুসলমান খৃষ্টান সকলে মিলেছিল তাদের শ্রেষ্ঠ সত্তায়, সেই মেলবার আসন ছিল ভারতের মহা ঐক্যতত্ত্ব। প্রকৃতপক্ষে রামমোহন ভারতপথিক হয়েও বিশ্বপথযাত্রী , যুগপুরুষ হয়েও যুগকে অতিক্রম করে গেছেন। তিনি যে বিজ্ঞানমনস্ক ও যুক্তিবাদী ভাবনা নিয়ে ভারতের প্রাচীন গোড়ামী ও কুসংস্কারকে অবজ্ঞা করে সাহিত্য, ধর্ম, শিক্ষা বিজ্ঞান, সমাজ নীতি, রাষ্ট্রনীতি— সর্বত্রই আপামর ভারতবাসীকে আধুনিকতার পাঠ দিয়েছিলেন। ভারতবাসীকে এই গোঁড়ামি কুসংস্কার আচ্ছন্ন অবস্থা থেকে মুক্তি দিতে তিনি যে সমস্ত বিজ্ঞানমনস্ক ভাবনাকে ভারতবর্ষের মধ্যে জাগিয়েছিলেন উক্ত প্রবন্ধে সেই সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

সূচক শব্দ- রাজা রামমোহন রায়, ভারতের, রেনেসাঁস, বিজ্ঞান, শিক্ষা, নবজাগরণ।

বাংলা রেনেসাঁসের সূত্রধার ও নবযুগ রচনায় প্রথম প্রাণপুরুষ রামমোহন ইউরোপীয় রেনেসাঁসের উৎকৃষ্ট ফসল সম্ভার ও সঞ্জীবনী সুধা যথা ইউরোপীয় শিল্প-সাহিত্য-দর্শন-বিজ্ঞান, যুক্তিনিষ্ঠা, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ, স্বাধীনতা প্রীতি, প্রকৃতিবাদ, কমৈষনা, সুস্থ-স্বাভাবিক মানবিকতা ইত্যাদির প্রতি আকৃষ্ট হয়ে প্রাচ্যের প্রাচীন প্রজ্ঞার মেলবন্ধন ঘটিইয়ে আমাদের দেশকে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। তাঁর দেখানো পথে আমাদের রেনেসাঁস, রিফর্মেশন (Reformatiom), রিভাইভাল, (Revival) ও এনলাইটেনমেন্ট (Enlightenment) ঊনবিংশ শতাব্দীতে ঘটেছিল। ইউরোপের মতো এ দেশেও রেনেসাঁসের স্তম্ভ বলতে বোঝায় জমিদার, বার্গার বা বণিক, উকিল,

ডাক্তার, সরকারী আমলা। ইংরেজি শিক্ষিত ধনী বাঙ্গালীদের শখ ছিল সাহেবদের মতো বাড়ি করা, গাড়ি চড়া, আসবার বিলিতি বই ও শিল্প দ্রব্য সংগ্রহ, এমনকি শিল্পশালায় ইউরোপের চিত্র ও ভাস্কর্যের নমুনা ঝোলানো। ইংরেজরা বাণিজ্য পণ্যের সঙ্গে আনেন ইউরোপীয় রেনেসাঁস উদ্বুদ্ধ আধুনিক বিজ্ঞান ভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গি ও মননশীল চেতনা। বহুভাষায় পারদর্শী রামমোহনের সঙ্গে রংপুরে পরিচয় হয় ইংরেজ সিভিলিয়ান জন ডিগবি-র যিনি তাঁর মনন জগতে প্রোথিত করালেন ইউরোপীয় জ্ঞান, বিজ্ঞান, দর্শন ও সাহিত্য।রামমোহন তাঁর কাছে পরিচিত ইউরোপের ইতিহাস,ফরাসী বিপ্লব এবং নিউটনের বিজ্ঞান গবেষণা এবং দার্শনিকদের তত্ত্বের সঙ্গে। বেকন, হিউম, গিবন, রুশো-ভলতেয়ার, টমপেনের মত বিদগ্ধ জনের কল্যাণকর মতবাদে স্নাত রামমোহনের জ্ঞানের পরিধি বিস্তৃত হয়।

ডিগবির অফিসে চাকরির সময় তাঁকে বিহার ও বাংলা নানা স্থানে বসবাস করতে হয়। ১৮১৪ সালে স্থায়ীভাবে কলকাতায় আসেন। অষ্টাদশ-ঊনবিংশ শতাব্দীতে খ্রিস্টান মিশনারী, ব্রাহ্মণ্যবাদ, রক্ষণশীল পুরাতন পন্থী, বৈষ্ণবধর্ম, সুফি মতবাদ ইত্যাদি নানা রকমের ধর্ম আন্দোলন এবং ধর্ম নিয়ে দ্বন্দ্ব ও বিরোধ ভারতবাসীর মনে ফল্গুনদীর মত প্রবাহিত ছিল। তখন রামমোহন অন্তরে অনুভব করেছিলেন যে, দেশের জনমানসে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে রেনেসাঁস উদ্ভূত ইউরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান যা নতুন মানব সমাজ গড়ার জন্য সঞ্জীবনী সুধার উৎস হিসেবে কাজ করবে। নতুন চিন্তাকে জনমানসে পৌঁছে দিতে তিনি প্রকাশ করলেন 'সংবাদ কৌমুদী', 'ব্রাহ্মণ সেবধি'। ফরাসি ভাষায়- 'মিরাৎ-উল-আকবর' ইত্যাদি পত্রিকা। উদ্দেশ্য ছিল হিন্দু ধর্মের কল্যাণকর দিকটা পৃথিবীর মানুষের কাছে তুলে ধরা। তাই তিনি ইংরেজিতে অনুবাদ করেন 'বেদান্ত গ্রন্থ' (১৮১৫), 'উপনিষদ' (১৮১৯) ইত্যাদি যুক্তিবাদী ও বিজ্ঞান ভিত্তিক ধর্মতত্ত্ব গ্রন্থ যা ইউরোপে দার্শনিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ইংল্যান্ডে থাকাকালীন রামমোহনের সঙ্গে ইউরোপীয় দার্শনিক বেন্থাম দর্শন প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করেন। সুস্থ যুক্তিবাদী মনের অধিকারী রামমোহন প্রকাশ করেন একটি পুস্তিকা- 'তুহ-ফাৎ-উল মুয়াহ হিদীনে' যেখানে তিনি বলেছেন- "জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের হৃদয় পরস্পরের প্রতি প্রীতি ভালোবাসা দিয়ে জয় করাই প্রকৃতির সৃষ্টি কর্তা একমাত্র ঈশ্বরের নিকট গ্রহণীয় বিশুদ্ধ পূজা।" তাঁর এই বিশ্বমানব প্রীতির আবেদন থেকেই অঙ্কুরিত হয় ব্রাহ্মসমাজ যেটি ফুলে ফলে পল্লবিত হয়ে পরবর্তীকালে নবজাগরণের রূপ নেয়। রামমোহন সংস্কৃত পাঠ নিয়েছেন হরিহরানন্দ অবধূত ও রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের কাছে। এছাড়া রামমোহনের সঙ্গে এশিয়াটিক সোসাইটি এবং ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পণ্ডিতদের যোগাযোগ ছিল। মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার- এর সঙ্গে তিনি বিতণ্ডায় জড়িয়ে পড়েছিলেন সত্যকার হিন্দুধর্ম নিয়ে। সতীদাহ সম্পর্কে ও বিধবা বিবাহ প্রসঙ্গে বিতর্কে রামমোহন ও বিদ্যাসাগর আমাদের দেখিয়ে গেছেন কিভাবে শাস্ত্রসাগর মন্থন করে সত্যকার ঐতিহ্যটি খুঁজে বের করতে হয় এবং তার সাহায্যে সুপ্রাচীন কিন্তু শ্বাসরুদ্ধ সংস্কৃতিকে আধুনিকীকরণের কাজে লাগানো যায়, কিন্তু তারা পুনরুজ্জীবনের আলোর পিছনে ছোটেননি। অদ্বৈত পন্থী রামমোহন শঙ্করের মায়াবাদ মেনে সংসার ত্যাগ করেননি, বরং তিনি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সাহায্যে সংসারকে ঐহিক ভাবে সুখী করতে চেয়েছেন। তাঁর ব্রাহ্মধর্মের ভিত্তিটা হল বেদান্ত। কিন্ত শঙ্করের মতো কট্টর অদ্বৈতবাদী তিনি নন। রামমোহনের মনে হল, শঙ্করের সন্ন্যাস ধর্ম বা বৈরাগ্য যুগের প্রয়োজনে অবান্তর ও মানব প্রকৃতির বিরোধী। তাই তিনি মায়াবাদ মেনে নেননি। এই জগৎ সংসার (phenomena) জাদুকরের ইন্দ্রজাল নয় অর্থাৎ জগৎ মিথ্যা নয় তা ব্রহ্মের ক্রিয়াশক্তির প্রকাশ, অলীক নয়- অনির্বচনীয়। সংসার ও গার্হস্থ্য ধর্মকে স্বীকার করতে হবে। রামমোহন জগৎ জীবন সম্বন্ধে সদর্থক দৃষ্টিভঙ্গি পেয়েছিলেন উপনিষদ থেকে। 'তুহ-ফাৎ-উল মুয়াহ হিদীনে' তে তিনি লিখেছেন- "আমি হিন্দু, মুসলমান খ্রিস্টানাদি নানা সম্প্রদায়ের ধর্মমত ও ধর্মশাস্ত্রের গূঢ় আলোচনা করিয়া দেখিয়াছি যে ঈশ্বর একমাত্র, অদ্বিতীয় ও তিনিই

উপাস্য।" প্রত্যেক ধর্মেরশাস্ত্র গ্রন্থের মূল পাঠ করে, আপন যুক্তি ও সহজ বুদ্ধি প্রয়োগ করে, রামমোহন ধর্মের কেন্দ্রীয় সত্যে পৌঁছাতে চাইলেন। আর তার জন্য লিখলেন হিব্রু, গ্রীক, আরবি-ফারসি। বাংলায় লিখলেন 'বেদান্তগ্রন্থ' ও 'বেদান্তসার'; অনুবাদ করলেন কেন, ঈশ, কঠ, মান্ডুক্য ও মুণ্ডক উপনিষদ। ধর্মের সামাজিক লক্ষ্য হবে লোকশ্রেয়স-জনকল্যাণ বা Social Comfort। তিনি লিখেছেন- "Religion inculcates universal love and charity", সব একত্র করলে এমন একটি 'Universal theism'-এ উপনীত হব, যা হিন্দু ধর্মের সর্বশাখা, ইসলাম, ইসাহিকে একসূত্রে বাঁধতে পারবে। রামমোহন যে বিজ্ঞান বিষয়ক আলোচনার পথিকৃৎ ছিলেন তার প্রমাণ 'সংবাদ কৌমুদী' পত্রিকাটিতে লেখা বিজ্ঞান প্রবন্ধ। ইংরেজ শাসনের দুটি সুফল তিনি লক্ষ্য করেছিলেন- ১. পাশ্চাত্য জ্ঞান বিজ্ঞান শিক্ষার প্রসার, বিশেষত্ব ব্যবহারিক বিজ্ঞান, ২. নয়া প্রযুক্তি ও বিদেশী মূলধন এর সাহায্যে ভারতের অর্থনৈতিক উন্নয়ন। রাজা রামমোহনের উদ্যোগে নিজের বাড়িতে তাঁর প্রতিষ্ঠিত 'আত্মীয় সভা'র অধিবেশনে কলকাতা সম্ভ্রান্ত হিন্দু বিশিষ্ট ব্যাক্তিদের সামনে প্রগতিপন্থী ডেভিড হেয়ার সাহেব ইউরোপের আধুনিক শিক্ষা ধারায় ইংরেজি সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন প্রভৃতির জন্য একটি উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার যে প্রস্তাব দিয়েছিলেন, সদস্য বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় তা নিয়ে গেলেন কলকাতা সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি স্যার এডওয়ার্ড হাইড ইস্টের কাছে (১৮১৬ সালের মে মাসে)। বৈদ্যনাথের মুখে উক্ত প্রস্তাবের কথা শোনা মাত্র ইস্টসাহেব অতি উৎসাহিত হয়ে তাঁর বাড়িতে নেতৃত্বস্থানীয় নাগরিকদের এক সভা আয়োজনের জন্য রামমোহনকে ডেকে পাঠালেন। সেই অনুসারে ১৮১৬ সালের ১৪ মে তারিখে স্যার ইস্ট মহোদয়ের বাড়িতে শহরের বাঙালি গণ্যমান্য ভদ্রলোকেদের যে ঐতিহাসিক সভা অনুষ্ঠিত হল তা ভারতের আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থার গোড়াপত্তনকে সূচিত করেছিল রামমোহনের সুযোগ্য নেতৃত্বে। ওই দিনটিতেই বোধ হয় হিন্দু কলেজের প্রথম বীজ বপন হয়েছিল। ১৮১৭ খ্রিস্টাব্দের ২০ শে জানুয়ারি হিন্দু কলেজ স্থাপিত হলো। হিন্দু কলেজের পরিকল্পনা হিন্দুদেরই। তারাই অর্থ দিয়েছিলেন। পরিচালক মণ্ডলীর সদস্য ছিলেন, বর্ধমানের মহারাজ তেজ বাহাদুর, পাথুরিয়াঘাটার গোপীমোহন দেব, শোভাবাজারের রাধাকান্ত দেব, পাইকপাড়ার সিংহরা। এরা তাদের সন্তানদের ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে পাশ্চাত্য জ্ঞান শিক্ষা দিতে চেয়েছিলেন, সাহেব বানাতে নয়। শিক্ষনীয় ভাষার মধ্যে প্রধানতম ছিল ইংরেজি, তারপর বাংলা, সংস্কৃত, ফার্সী। ইতিহাস, ভূগোল, জ্যোতির্বিদ্যা, রসায়ন ও অন্যান্য বিজ্ঞানের পাঠ দেওয়া হতো ইংরেজিতে। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের যেন পরিপূরক হয়ে উঠল হিন্দু কলেজ। প্রথমটাতে (ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ) সাহেব, সিভিলিয়ানদের ভারতীয় সংস্কৃতিতে দীক্ষা দেওয়া হবে। দ্বিতীয়টাতে (হিন্দু কলেজ) ভারতীয় অভিজাত ভদ্রলোকদের পাশ্চাত্য সংস্কৃতিকে দীক্ষা দেওয়া হতো। ১৭৮৪ খ্রিস্টাব্দে ১৫ ই জানুয়ারি মাসে ওয়ারেন হেস্টিংস এর আমলে এশিয়াটিক সোসাইটি স্থাপিত হওয়ায় দু' দশকের মধ্যে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ, আরো দু' দশকের মধ্যে হিন্দু কলেজ স্থাপিত হলো। ইংরেজি মাধ্যমে পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের অভিযান পুরোদমে শুরু হয়ে গেল মেকলের ১৮৩৫ সালের মিনিটের পর। বলাবাহুল্য এটা বৈপরীত্য (Dichotomy) সৃষ্টি হল। এশিয়াটিক সোসাইটির লুপ্তপ্রায় প্রাচ্যবিদ্যাকে আবিষ্কার করল, ১৮০০ খ্রিস্টাব্দের ১০ জুলাই লর্ড ওয়েলেসলির আমলে প্রতিষ্ঠিত ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ বাংলা গদ্য সাহিত্যের জন্ম দিল এবং হিন্দু কলেজ পশ্চিমের সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শনকে নতুন বাঙালি প্রজন্মের মুগ্ধ চোখের সামনে তুলে ধরল। ১৭৭৮ খ্রিস্টাব্দে হ্যালহেডের বাংলা ব্যাকরন ও উইলকিনসের গীতার অনুবাদের পর এল উইলিয়াম জোন্সের কালিদাসের শকুন্তলা ও কিছু বৈদিক সূক্তের অনুবাদ এবং কোলব্রুকের বেদের অনুবাদ ও আর্য গণিত নিয়ে গবেষণা। উইলিয়াম কেরির প্রস্তাবে জোর দেওয়া হয় দেশীয় ভাষার মাধ্যমে জনশিক্ষার ওপর। কেরি বাইবেল অনুবাদ এর সঙ্গে হাত দিলেন বাংলা কথ্য ভাষার নিদর্শন স্বরূপ 'কথোপকথন' রচনায়, যার ফলশ্রুতিতে রামরাম বসু ও তারিণীচরণ মিত্রের হাত ধরে

আর একরকম গদ্য বেরোল। ১৭৯৯ খ্রিস্টাব্দে ফষ্টার সাহেব ইংরাজী-বাংলা অভিধান প্রকাশ করেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে হুগলির শ্রীরামপুরে কেরি, মার্শম্যান, ওয়ার্ড প্রমুখের চেষ্টায় প্রথম মুদ্রণ যন্ত্র স্থাপিত হইল। ১৮০১ খ্রিস্টাব্দে শ্রীরামপুর প্রেসে প্রকাশিত হয় কেরি সাহেবের অভিধান, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের 'বেদান্ত চন্দ্রিকা', 'হিতোপদেশ' ও 'বত্রিশ সিংহাসন' রামমোহনের 'বেদান্তগ্রন্থ' রামরাম বসুর 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র' মধ্যযুগের কাশীদাসী মহাভারত ও কৃত্তিবাসী রামায়ণ পুস্তকগুলো নানাদিক থেকে বাঙালি চিত্তকে আলোড়িত করতে থাকল।

রামমোহনের ভারতপন্থায় জ্ঞান ছিল, কর্ম ছিল, বহুজনের হিতের কথাও ছিল কিন্তু ভক্তি ও সৌন্দর্য সাধনা ছিলনা। ইংরেজদের মধ্যে একটি দল প্রাচ্যদেশের লোকের পক্ষে প্রাচ্য বিদ্যাই শ্রেয় ভেবে নেটিভদের মধ্যে আরবী, ফরাসি ও সংস্কৃত শিক্ষার জন্য এক লক্ষ টাকা ব্যয় মঞ্জুর করেন। এরকম কর্মসূচি রামমোহনের মন:পূত হয়নি। ১৮২৩ খ্রিস্টাব্দে লর্ড আর্মহাস্ট কে রাজা রামমোহন রায় তার সেই ঐতিহাসিক চিঠিতে লিখেছিলেন- "..... সুতরাং এশিয়াবাসীর প্রথম কর্তব্য ইউরোপ হইতে বিজ্ঞানের গাছ আনিয়া এশিয়ার মাটিতে রোপণ করা"। (.....But as the improvement of the native population of the Government, it will consequently promote a liberal and enlightened system of instruction embracing Mathematics, Natural philosophy, Chemistry, Anatomy, with other useful Sciences, which may be accomplished with the sums proposed by employing a few gentleman of talent and learning, educated in Europe and providing a college furnished with necessary books, implements and other apparatus.) অভিজাত ও রক্ষণশীল পন্থীরা হিন্দু স্কুলে কার্যকরী পরিচালন সমিতিতে রামমোহনকে স্থান দিলেন না। এমতাবস্থায় রামমোহন নিজেই 'অ্যাংলো হিন্দু স্কুল' নামে একটি ইংরেজি স্কুল খোলেন (১৮২২) যেখানে ছাত্র হিসেবে ঠাঁই পান রামমোহনের ছেলে রমাপ্রসাদ ও দ্বারকানাথ ঠাকুরের ছেলে দেবেন্দ্রনাথ। নিত্যনতুন বিজ্ঞানের চিন্তাগুলি আবিষ্কৃত তথ্যগুলিকে মাতৃভাষার মাধ্যমে ছাত্রদের কাছে পৌঁছে দিতে ও জনসাধারণের বিজ্ঞান চেতনা বৃদ্ধি করতে ১৮২১-১৮২৪ সালের মধ্যে রামমোহন বিজ্ঞানের উৎকৃষ্ট বইগুলি যথা ভূগোল, জ্যোতির্বিজ্ঞান ও জ্যামিতি লিখেছেন। মুদ্রণে সাহায্য করেন স্কুল বুক সোসাইটি। ফরাসি ভাষায় প্রকাশিত 'মিরাত-উল-আকবর' শীর্ষক তাঁর পত্রিকায় রামমোহন কয়েকটি বিজ্ঞানের প্রবন্ধ যথা- 'প্রতিধ্বনি', 'চৌম্বকের ধর্ম', 'বেলুনের বর্ণনা', 'মাছেদের জীবন ও গতিবিধি' ইত্যাদি তুলে ধরেন। সেই সময় বাংলা গদ্য সাহিত্যের অভাব উপলব্ধি করে রামমোহন বাংলা ভাষার উৎকর্ষের দিকে দৃষ্টি দেন। রামমোহন গদ্য রচনার ক্ষেত্রে কর্তা, কর্ম ও ক্রিয়ার সুষ্ঠু ব্যবহার প্রচলন করেন। ফলে বাংলা গদ্য সাহিত্যের মধ্যে শৃঙ্খলা বোধ আসে। তাঁর রচিত বই 'গোড়ার ব্যাকরন' (১৮৩৩) থেকে তাঁর ব্যাকরন বোধের গভীরতা বোঝা যায়। রামমোহনকে তাঁর লেখা পত্রিকা ও পুস্তিকা ছাপার জন্য নিজ অর্থে ছাপাখানার যন্ত্রপাতি কিনতে হয়। রবীন্দ্রনাথের কথায় "রামমোহন বঙ্গসাহিত্যকে গ্রানাইট স্তরের উপর স্থাপন করিয়া নিমজ্জন- দশা হইতে উন্নত করিয়া তুলিয়াছিলেন"। রামেন্দ্রসুন্দর বলছেন যে- রামমোহন দেশের লোককে বোঝাবার জন্য বাংলা ভাষায় সাময়িকপত্র প্রচার করেন, বাংলায় বেদান্ত শাস্ত্র প্রকাশ করেন, এমনকি বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে বাংলা ভাষার 'প্রথম ও শেষ ব্যাকরণ' লেখেন। কালের বিচারে নবজাগরণের প্রথম প্রাণপুরুষ রামমোহন সম্পর্কে মোহিতলালের ভাষায়- "রামমোহন সকল বিষয়ে বাস্তব প্রয়োজনও যুক্তিকে প্রাধান্য দিয়া সমাজ- শাসন বা শাস্ত্রবিধি অমান্য করিবার পন্থা নির্দেশ করিলেন; রামমোহনই সর্বপ্রথম এই মৃতকল্প জাতির ঘোর তামসিকতাকে সাত্ত্বিকতার ভানমুক্ত করিয়া একটি রাজসিক আদর্শের প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হইয়াছিলেন। ধর্ম ও সমাজচিন্তায় জাতির যে অন্ধ তামসিকতা, চিরাচরিত প্রথানুগত্য ও জড়ত্বময় কর্মহীনতা- তার বিরুদ্ধে রামমোহনের মতো বিবেকানন্দও সক্রিয় কর্মোদ্যমে ব্রতী হয়েছিলেন।"

সেই হেতুই যুক্তিনিষ্ঠ মানবিকতার উপরই বেদান্তকে নবজাগ্রত ভারতের রাষ্ট্রীয় ধর্মকে জাতীয় ধর্ম (সার্বভৌম ধর্ম) হিসাবে তিনি গ্রহণ করেছিলেন। পরবর্তীকালে স্বামীজী Practical Vedanta-কে নবভারত সংগঠনের প্রয়োজনে এক অদ্বিতীয় আদর্শরূপে গ্রহণ করেন। ১৮২৮ সালে ডিগবী সাহেবের কাছে এক পত্রে রামমোহন লিখেছিলেন- "It is, I think, necessary that some change should take place in their religion at least for the sake of their political advantage and social comfort".

ভারতবাসী আজ অতিক্রম করেছে অনেকটা পথ। এই পথ চলায় কখনো বিদেশি শক্তির মুখোমুখি হতে হয়েছে, আবার কখনও দরকার হয়ে পড়েছে সমাজ সংস্কারের। এই দীর্ঘ পথ জুড়ে দেশকে এগিয়ে নেওয়ার দায়িত্ব নিয়েছেন বহু প্রবাদপ্রতিম মনীষীরা, যারা সমস্ত সমালোচনা অবজ্ঞা করে দেশকে ভালোবেসে আত্মত্যাগ আর আদর্শের পথে নিজেদের নিয়োজিত করেছেন। হ্যাঁ, রাজা রামমোহন রায়ই একজন ছিলেন তাঁদের মধ্যে যার প্রদর্শিত পথে দেশ দেখেছিল পরিবর্তনের হাওয়া। এবছর ২০ মে সারা ভারত জুড়ে পালিত হয়েছে তাঁর ২৫০ তম জন্মবার্ষিকী। আজও আমাদের সমাজ নতমস্তকে কৃতজ্ঞ তাঁর কাছে। সাহিত্য, ধর্ম, শিক্ষা বিজ্ঞান, সমাজ নীতি, রাষ্ট্রনীতি— সর্বত্রই আপামর ভারতবাসীকে আধুনিকতার পাঠ দিয়েছিলেন রাজা রামমোহন রায়। গত ২৫০ বছরে দেশ বদলেছে অনেকটাই। পরাধীনতার শৃঙ্খল ভেঙে ভারত আজ স্বাধীন। আজকের ভারতের শিক্ষাব্যবস্থা আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষার বুনিয়াদের উপর দাঁড়িয়ে। তাই গণিত, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, রসায়ন, সমাজ বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, পদার্থ বিদ্যার সহাবস্থান রয়েছে ভারতের স্কুল, কলেজ, ইউনিভার্সিটিতে। বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহের পথ ছেড়ে ভারত আজ আধুনিক। সতীদাহ আজ স্রেফ অন্ধকার অতীত। তাই এই দেশ ও দশ শুধু কৃতজ্ঞ নয়, বরং তাঁর দেখানো পথেই এগিয়ে যাবে সামনের দিনে। তবে রাজা রামমোহন রায়ের প্রাসঙ্গিকতা কিন্তু এতটুকু কমেনি বর্তমান ভারতে। আজও সমাজে রয়েছে ধর্মের ভিত্তিতে হিংসা হানাহানি, নারী সুরক্ষা আজও প্রশ্নের মুখে এবং ভারতে আজও প্রতিদিন স্রেফ পণের দাবির মুখে অত্যাচারের মুখোমুখি হয়ে মৃত্যুর সাথে লড়তে হয় মেয়েদের। শিক্ষা আজ স্রেফ ডিগ্রি অর্জন করার পদ্ধতি হয়ে দাঁড়িয়েছে, সত্যিকারের শিক্ষা আজ কথার কথা হয়ে দাঁড়িয়েছে। নৈতিকতার ও মূল্যবোধের অবক্ষয় ভারতীয় সমাজকে এক অদ্ভুত সংকটের সামনে এসে দাঁড় করিয়েছে। নিঃসন্দেহে ভারতের এক নব্য নবজাগরণের প্রয়োজন, যেখানে সমাজের দোষ ত্রুটিগুলো প্রশ্ন করা হবে, উলঙ্গ রাজার সভায় সেই বাচ্চাটিকে খুঁজে পাওয়া যাবে আর অবশ্যই ন্যায় প্রতিষ্ঠা হবে।

তথ্যসূত্র

১) সরকার সুশোভন, বাংলার রেনেসান্স,দীপায়ন, নভেম্বর ২০১১

২) Guha Ramchandra, 'Raja Rammohan Roy: The First Liberal of india,' Penguin,2018

৩) কুন্ডু সুরেশ, রাজা রামমোহন রায় : ফিরে দেখা, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ

৪) চট্টোপাধ্যায় নগেন্দ্রনাথ, মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত, রায় প্রেস ডিপোজিটরি, কলিকাতা, ২০২১

৫) ত্রিপাঠী অমলেশ, ইতালির রেনেসাঁস বাঙালীর সংস্কৃতি, আনন্দ পাবলিশার্স।

৬) Majumder R. C, 'On Rammohan Roy', The Asiatic society Calcutta, (1984), পৃ – ৫-৭ ,

৭) https://www.inbengali.com

৮) চৌধুরী শ্রী ভূদেব, বাংলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, পৃ - ১৪২

৯) https ://bangali.hindustantimes.com

১০) বিশ্বাস দিলীপ কুমার, রামমোহন সমীক্ষা, প্রশান্ত ভট্টাচার্য সারস্বত লাইব্রেরী, কলকাতা পৃ – ৪৯-৫৩,

১১) bengali.abplive.com

১২) Raja Ram Mohan Roy To Tagore Remembering The True Spirit of the Bengali Renaissance , volume - 10, www.ijcrt.org

১৩) https ://www.gktoday.in